ই লি রি য়া না

কাজী জহিরুল ইসলাম

কিস্তি-৪

উরিমে পার দিয়োলিন (পুত্র সন্তানের পিতা হওয়ায় জন্য অভিনন্দন)।
ক্রেশনিকের এ অভিনন্দনের জবাবে আফ্রিম চাপা উষ্মা মিশ্রিত কণ্ঠে বলে,
ফালমিন্দারিত বুদাল (ধন্যবাদ বেকুব)।
শুধু দাঁত না, মাড়ি পর্যন্ত বের করে একটি দিগন্ত বিস্তৃত বেকুবের হাসি দেয় ক্রেশনিক। সকালের সূর্য গোলাপী মাড়িতে প্রতিফলিত হয়ে ওর বোকা বোকা ভাবটাকে আরো ফুটিয়ে তুলেছে।
আফ্রিমের ইচ্ছে হচ্ছিলো ওর পাছায় একটা যুৎসই লাথি কষতে কিন্তু ইচ্ছেটাকে সামলে নেয় ও। গ্রামে নিজের অবস্থানটা আগে ভালো করে জানতে হবে। যুদ্ধের পর সকলেরই রক্ত গরম। বিশেষ করে ওর ঘরে যে শিশুটি রয়েছে তার প্রকৃত পরিচয় ইতোমধ্যেই গ্রামে ছড়িয়েছে কি-না তা জানা খুবই জরুরী। এর ওপরই নির্ভর করছে রাহোভেচের আলবেনিয়ান সমাজে ওর অবস্থান।

অল্প কথায় ক্রেশনিককে বিদায় করে আলফাতে ঢোকে আফ্রিম। আলফাই উপযুক্ত দোকান ওর পকেটের তালিকা অনুযায়ী জিনিসপত্র কেনার জন্য। কাঁচা পয়সার আলামত। দুই থেকে তিন লক্ষ ডয়েশমার্কের কম বিনিয়োগ করা হয়নি এই দোকানটিতে। ফাদিল গাশির এতো টাকা রাতারাতি কেমন করে হলো? পশ্চিমা স্টাইলে দালানও তুলেছে বাড়িতে। যুদ্ধের সময়তো শরণার্থী হয়ে পাড়ি জমিয়েছিল সুইডেনে। ফিরেছে এখনো বছর ঘুরেনি, এরি মধ্যে এতো কিছু! বিশাল সুপারমার্কেট আলফার এ মাথা ও মাথা বার দুয়েক চক্কর খেয়ে ওক কাঠের শেলফগুলোতে কিছু একটা খুঁজছে আফ্রিম কিন্তু কিছুতেই ওটা খুঁজে পাচ্ছে না। লাল এপ্রণ পরা একজন তরুণী এগিয়ে আসে আফ্রিমের কাছে, ও যখন হঠাৎ আফ্রিমের কাছে এসে চলার গতি থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে তখন ওর ভারী বুকটা স্প্রিঙয়ের মতো লাফিয়ে ওঠে।
আমি কি তোমাকে সাহায্য করতে পারি?
মনে মনে বলে আফ্রিম, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তুমি আমাকে সাহায্য করতে পারো সুন্দরী কিন্তু আমি যে তোমাকে বলতে চাই না আমি কি খুঁজছি।
মুখে বলে, ধন্যবাদ, লাগবে না।
মেয়েটি ঠিক একই ভঙ্গিতে এগিয়ে যায় অন্য একজন বিদেশী ক্রেতার কাছে। ক্রেতাটি কালো, আফ্রিকান। ইউএন পুলিশ। স্টিলের ঝুড়ি হাতে হাঁটছে শপের এ মাথা থেকে ও মাথা আর এটা সেটা তুলে নিচ্ছে ঝুড়িতে। বিক্রয় কর্মী উর্বশী আলবেনিয়ান তরুণীটি এক মিটার দূরত্ব বজায় রেখে হাঁটছে কালো পুলিশটির পেছন পেছন। মেটে রঙের উইনিফর্ম পরা পুলিশ কয়েক পা এগিয়ে থামে একটি

শেলফের সামনে, নেড়ে-চেড়ে দেখে দ্রব্যসামগ্রী, মেয়েটিও তখন থেমে পড়ে। আর তখনি ওকে কিছুটা অপ্রস্তুত মনে হয়। হয় পেছনে দুহাত বেঁধে ডানে-বাঁয়ে অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে তাকাচ্ছে, না হয় দাঁত দিয়ে আনমনে নখ খুঁটতে শুরু করছে। স্পস্ট অভিজ্ঞতার অভাব। কালো পুলিশটি হাঁটতে শুরু করলে লাল এপ্রণের মেয়েটিও আবার হাঁটতে শুরু করে। যেন প্রোগ্রাম করে ছেড়ে দেওয়া একটি পুতুল।

ক্যাশ কাউন্টারে বিল মিটিয়ে দ্রব্যসামগ্রী পলিথিনের ব্যাগে পুরে যখন আলফা থেকে বেরুলো আফ্রিম, আকাশে তখন ঝকমকে রোদের হাসি। এদিক-সেদিক ছেঁড়া ছেঁড়া কিছু গেরিলা মেঘ, তারই ছায়া পড়েছে দূরের পাহাড়ে, ঝাউবনে, পাহাড়ের ভ্যালিতে।

দ্রিতনের সাথে চোখাচোখি হয়নি আফ্রিমের, ও হনহনিয়ে হেঁটে যাচ্ছে কেন্দ্রের দিকে। ওকে দেখে হঠাৎ থেমে পড়ে আফ্রিম কিন্তু দ্রিতনের গতিতে কোন কম্পন নেই, হোচট নেই, ও হাঁটছে একই গতিতে, একই ভঙ্গিতে। ছোট এক চিলতে শহর। চলতে ফিরতে গায়ে গায়ে ধাক্কা লাগে। ঘর থেকে বেরুলেই দেখা হয়ে যায় সকলের সাথে সকলের। ছোট শহরে থাকার এই হলো সুবিধা। আবার অসুবিধাও আছে। যাকে দেখতে ইচ্ছে করে না, তার সাথেও দেখা হয়ে যায়। আফ্রিম ওকে দেখে থেমে পড়লো কেন? অনেক দিন পর রাহোভেচে ফিরে এসে ও যেন ছন্দ হারিয়ে ফেলেছে। সবকিছু কেমন অন্যরকম লাগে আফ্রিমের কাছে। হাঁটায়, চলায় এমনকি কারো সাথে কথা বলায়ও ও আর আগের সেই ছন্দটা খুঁজে পাচ্ছে না। কদিন গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। মনে মনে নিজেকে শান্তনা দেয় ও। উল্টোদিকে আবার হাঁটতে থাকে আফ্রিম। ওর গন্তব্য এই এসফল্টের রাস্তাটির মাথায়, ডানদিকের পাহাড় থেকে নেমে আসা খাড়া যে মেঠোপথ, পাহাড়ের সিঁথি হয়ে ওপরে উঠে যাওয়া মেঠোপথের প্রথম বাঁকটিতে যে বিশাল কাঠের তোরণ এবং সেই তোরণের ভেতরে দেয়ালঘেরা যে তিনটি ঘর, তারই একটিতে, যেখানে এমিনের মাতৃক্রোড়ে হাসছে পাভারেসি।

আফ্রিমের ভেতরটা হঠাৎ কেঁপে ওঠে। ক্রমশ নিজের সন্তানের মতোই ওই শিশুটির প্রতি মমতার একটি বীজ অঙ্কুরিত হচ্ছে ওর ভেতরে, বেড়ে উঠছে, শেকড় ছাড়ছে। একটি দ্বৈত সত্বা তড়াক করে মাথা তোলে তখন। ও একটি সার্বিয়ান শিশু। ওর প্রতি মমতা নয় বড়জোর খানিকটা করুণা হতে পারে। কথাটা ভেবেই আবার সাথে সাথে শোধরাতে চায় আফ্রিম, সার্বিয়ান শিশু নয়, এক উচেকা বীরাঙ্গনার সন্তান। এরপরই ওর ভাবনার সমুদ্রে ঝড় ওঠে, জলোচ্ছাস শুরু হয়। ও টের পায় এ শিশুকে কেন্দ্র করেই ওর জীবনে নেমে আসবে অশুভ কালো মেঘ। শুরু হবে বিভাজনের ঝড়। দ্বন্দ্ব শুরু হবে দুই ভাইয়ের মধ্যে, ভাঙন ধরবে পরিবারে। সেই ভাঙনের ঢেউ হয়ত লাগবে গিয়ে পুরো আলবেনিয়ান কম্যুনিটিতে।

ভুলটা আফ্রিমই করে। গত বারো বছরে অনেক ঝগড়া, অনেক কথা কাটকাটি হয়েছে। কিন্তু এই ভুলটা ওদের দুজনের কেউই কখনো করেনি। আফ্রিম কি ধীরে ধীরে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছে? এমিনের ভাবনাটা কোন এক অলৌকিক উপায়ে বুঝে ফেলে আফ্রিম। অথবা টেলিপ্যাথিক উপায়ে আফ্রিমও

নিজের সম্পর্কে ঠিক একই চিন্তা করতে থাকে। গত বারো বছরে ওরা বাবা-মা হতে পারেনি, এ দোষ কার? আফ্রিমের না এমিনের? এ খবর এমিনে না জানলেও আফ্রিম ঠিকই জানে, ওর ফার্টিলিটি নেই। একবার না বেশ কবার গোপনে ডাক্তারের কাছে গিয়েছে আফ্রিম। কিন্তু এমিনে ডাক্তারের কাছে যাওয়ার কথা বললেই ও বলে, কি দরকার, যদের ইচ্ছে হলেই বাচ্চা হবে। তাহলে কি এমিনে কোনভাবে টের পেয়েছে অক্ষমতাটা ওর, এমিনের না? আর তারই মৌন প্রতিশোধ নিতে ওর খালাত বোন ইলিরিয়ানার গর্ভে জন্ম নেয়া যুদ্ধশিশুটিকে কোলে তুলে নিয়েছে এমিনে? যেভাবেই ভাবে না কেন, ভাবনার প্রান্তে একটি দোষ বের হয় এমিনের। এটা কি এমিনের প্রতি ওর পুঞ্জিভূত ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ? না, এমিনেকে ও ভালোবাসে। এমিনের প্রতি ওর ভালোবাসা কসোভোর সকল পর্বতপ্রমাণ অপরাধের ভারের চেয়েও শক্তিশালী। তাহলে আজ সমস্ত ভাবনার তীরগুলো শুধু এমিনের গায়ে আঘাত করছে কেন?

দুটি ভিন্ন দ্বীপের বাসিন্দা এখন ওরা দু'জন, একই বিছানায় শুয়েও। ওদের দুই বাই আড়াই মিটারের বিশাল বিছানার পাশেই একটি ছোট্ট বেবীকট, তার ওপর শুয়ে থাকা ওই ক্ষুদে শিশুটিই এখন এ বাড়ির, হয়ত পুরো রাহোভেচের চিন্তা, দুশ্চিন্তা অথবা মুখরোচক গল্পের প্রধান বিষয়বস্তু। আফ্রিমের মনে হয় বেবীকট থেকে শিশুটি হঠাৎ উঠে এসে ওদের দুজনের মাঝখানে শুয়ে পড়েছে। আস্তে আস্তে শিশুটি আর শিশু থাকে না, কোন এক অলৌকিক উপায়ে সে একটি নিরেট দেয়াল হয়ে যায়। সেই দেয়ালের ওপাশে এমিনে। যাকে হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায় না। এ দেয়াল ভাঙতে হবে।

এমিনে কি ঘুমিয়ে পড়েছে? মোটেও না। ওকে হাঁড়ে হাঁড়ে চেনে আফ্রিম। ঘাপটি মেরে পড়ে আছে। যতক্ষণ না আফ্রিম ওর গায়ে হাত দেবে, ঠোঁটে চুমু খাবে, ব্রা'র হুক খুলে সমস্ত শরীরে হাত বুলাবে ততোক্ষণ ও এভাবেই পড়ে থাকবে। মুখের ভাষা এ সময় মূল্যহীন, শরীরের ভাষাটাই মূখ্য। শরীর দিয়ে নেভাতে হবে মনের আগুন, স্পর্শের সুখ দিয়ে সারিয়ে তুলতে হবে অভিমানের ক্ষত। নিশুতি রাত যেভাবে চিরচেনা পথ ধরে এগিয়ে যায় ভোরের কাছে তেমনি আফ্রিমও এগোয় ওর বারো বছরের চেনা পথে। রাতের মতোই নিরেট আর গভীর অন্ধকার দু'হাতে সরিয়ে সরিয়ে ভোরের আলো ফোটাতে মরিয়া হয়ে ওঠে আফ্রিম।

প্রথমে ওর পিঠে হাত রাখে আফ্রিম। তারপর সে হাত অবলীলায় শিরদাঁড়া বেয়ে গ্রীবার কাছে বাঁক নিয়ে গলার মসৃণ ত্বকে আলতো বিলি কেটে নেমে আসে স্তনযুগলের ঠিক ওপরে প্রশস্ত বুকের মাঝখানে; যেখানে এমিনের তৈলাক্ত ত্বকে গজিয়ে উঠেছে ঘামাচির মতো ছোট ছোট কয়েকটি ব্রণ। বাঁ হাতে ব্রণ খুঁটতে খুঁটতে ডান হাতের ওপর বিছানায় ভর রেখে মুখটা তুলে আনে এমিনের ঘাড়ের ওপর, ঠিক যেখানে ওর মসৃণ ত্বক ফুড়ে সর্বশেষ সোনালী চুলের শেকড়টি গজিয়ে উঠেছে। আফ্রিম প্রলম্বিত চুমু খায় সেখানে, ওর ভারী নিঃশ্বাসের ওমে এতোক্ষণে নড়ে ওঠে এমিনে। এরপরেই একজনের খেলা হয়ে যায় দু'জনের, দু'জনেই সমানে সমান।

মহালের উত্তর সীমান্তে পাশাপাশি এক কাতারে তিনটি ঘর দাঁড়িয়ে আছে। মূল তোরণের দিক থেকে প্রথম ঘরটি দ্রিতনের, এটি অন্য দুটি ঘরের চেয়ে অপেক্ষাকৃত ছোট। মাঝেরটি আফ্রিমের এবং শেষের বড় ঘরটি ওদের বাবা-মা ইদ্রিস এবং দেয়ার। এ ঘরেই একে একে বেড়ে উঠেছে আফ্রিম, দ্রিতন এবং ওদের একমাত্র জার্মান প্রবাসী বোন নুশে। ট্রান্সপোর্ট বিভাগের চাকরীর পাশাপাশি নিজের জমিতে গম, ভূট্টা, আলু, মরিচ ফলিয়ে যা আয় করেছে ইদ্রিস তা দিয়ে দুই ছেলের জন্য এ দুটি ঘর তুলেছে। এর পেছনে কন্যা নুশেরও কিছু অবদান আছে। পিতার অভাবের সংসারে প্রায়ই নুশে জার্মানী থেকে টাকা পাঠায়, ইদ্রিস সে টাকার এক কানাকড়িও সংসারের খাওয়া-পরার জন্য ব্যয় করেনি। কন্যার পাঠানো টাকার পুরোটাই ব্যয় করেছে ঘর দুটি তুলতে। এই ঘরগুলোর ইট, কাঠ, সিমেন্ট, বালুতে লেগে আছে অনেক কষ্টের সুখস্মৃতি। সুলেইমানী পরিবারের এই সুবিশাল কাঠের তোরণে লেগে আছে ওর দাদার হাতের মমতার চিহ্ন। এই তোরণই ওদের চার প্রজন্মের পরম্পরা। আজ সেই তোরণ ভেঙে দেবে রাহোভেচের মানুষ? ইদ্রিসের কষ্টের টাকায় তিল তিল করে গড়ে তোলা এই সুলেইমানী বাড়ি, ভেঙে দেবে ওরই বন্ধু-প্রতিবেশীরা? আর ও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা দেখবে?

তোরণের বাইরে এক দঙ্গল মানুষের হট্টগোল। ক'জন বয়স্ক লোক ইদ্রিসের নাম ধরে ডাকে।

বেরিয়ে এসো ইদ্রিস। তোমাকেতো আমরা খাঁটি ইলের বলেই জানতাম!
সার্বদের সাথে হাত মেলালে কবে?
কতো পেলে হে?
ভাগ-টাগ আমাদেরও দাও।
কেউ একজন হট্টগোলের ভেতর থেকে কণ্ঠ চড়ায়।
থামো তোমরা। মশকরা রাখ। আমরা সুলেইমানীর সাথে ইয়ার্কি মারতে আসিনি। আমরা এসেছি সার্বিয়ান শিশুটিকে নিয়ে যেতে। যদি কেউ বাধা দেয় তাহলে সুলেইমানী বাড়ি গুড়িয়ে দেব। সুলেইমানীদের লাশ পড়ে যাবে।

এরপর কাঠের তোরণে দুদ্দার শব্দ হতে থাকে। ওরা কি গেইট ভেঙে ফেলছে? ইদ্রিস দরোজা খুলতে এগিয়ে যায়। দেয়া পেছন থেকে ওর বহু পুরোনো জরাজীর্ণ সামার জ্যাকেটটি খামচে ধরে। এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ে দেয়া। মুখে কিছুই বলতে পারে না। ওর চোখ থেকে তখন হরহর করে পানি পড়ে। দেয়ার ঝাপসা চোখে এক সমুদ্র ঘৃণা। সেই ঘৃণার স্রোতে খড়-কুটোর মতো ও ভাসিয়ে দিতে চায় অপয়া বৌমাকে।
এবার সমবেত গর্জন:
এই সুলেইমানীর বাচ্চা, গেইট খোল। নইলে কিন্তু ভেঙে গুড়িয়ে দেব।
দ্রিতন, এই দ্রিতন।
একটি কিশোর কণ্ঠ দ্রিতনের নাম ধরে ডাকে। ভেতর থেকে কোন সাড়া আসে না। স্বচ্ছ নীল আকাশ। কড়া রোদ মাথার ওপর। মাঝে মাঝেই রোদে পোড়া চামড়ায় ঠান্ডা বাতাশ হাত বুলিয়ে যায়।

ভেতরে দ্রিতন খুব চোটপাট করে। চাপা কণ্ঠ কিন্তু ওর তর্জন-গর্জনের শব্দ বুঝি কিছুটা সুলেইমানী বাড়ির বাইরেও এসে ছড়িয়ে পড়ে।

পাভারেসিকে বুকের সঙ্গে চেপে ধরে এমিনে। সামনে আফ্রিম দাঁড়িয়ে। এমিনের মনে হয় এক্ষুণি আফ্রিম ওর কোল থেকে পাভারেসিকে ছিনিয়ে নেবে। এরপর ছুঁড়ে দেবে বাইরের আগুনে। আফ্রিম হাত বাড়ায়। এমিনের চোয়াল শক্ত হয়। দৃষ্টি তীর্যক হয়। সশব্দে চিৎকার করে ওঠে, না, খবরদার, ছোঁবে না ওকে। আফ্রিম ছোঁয়। পাভারেসির পাতলা রেশমের মতো নরোম সোনালী চুলে বাঁ হাতের আঙুলের ডগা ছোঁয়ায়। এমিনের চোখের দিকে একবার তাকায়। আফ্রিমের দৃষ্টিতে গভীর মমতা এবং বিশ্বাস।

আফ্রিম উঠোনে এসে দাঁড়ায়। দ্রিতন চাপা কণ্ঠে বিড়বিড় করে কিছু বলছে ইদ্রিসকে। আফ্রিমকে দেখেই এক লাফে ওর সামনে এসে দাঁড়ায়। শার্টের কলার চেপে ধরে আফ্রিমের।
দিয়ে দাও ওই শিশু। ও আমাদের কেউ না।
এক সপ্তাহ আগেই এর ফয়সালা হয়ে গেছে।
কথাটা বলেই আফ্রিম তাকায় ইদ্রিসের চোখের দিকে।
তাহলে বাড়ি-ঘর ভেঙে দিক? হত্যা করুক আমাদের সবাইকে, ওই শিশুর জন্য?
আফ্রিম কিছু বলে না। ইদ্রিস আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। আঙুড়ের মাচায় সদ্য গজানো সবুজ পাতারা বসন্তের হাওয়ায় তিরতির করে কাঁপছে।

কি হলো? দরোজা খুলবে? নাকি ভেঙে ঢুকবো?
কিছু অসহিষ্ণু হাতের কিল ঘুষির শব্দ আবারো শোনা যায়। উঠোনে, আঙুড়ের মাচার নিচে, সবাইকে পেছনে ফেলে ইদ্রিস দরোজার দিকে এগিয়ে যায়।
বাবা
আফ্রিমের ডাকে থমকে দাঁড়ায় ইদ্রিস। ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকায়।
তুমি ননাকে নিয়ে ঘরে যাও। আমি ওদের সাথে কথা বলি। আগুন জ্বালিয়েছি আমি, আমাকেই নেভাতে হবে। দরকার হলে তা কেবল আমারি রক্তে।
আফ্রিম কাঠের বিশাল এবং ভারী চাপানিটাতে হাত রাখে। ওর দুই গজ পেছনে ইদ্রিস দাঁড়িয়ে আছে। একটি কঠিন হাত ওর হাতের ওপর। এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ে দ্রিতন। তারপর চোখের ইশারায় ওকে এবং ওদের সবাইকে ঘরের ভেতরে চলে যেতে বলে। সেই দৃষ্টিতে কঠিন নির্দেশের স্পস্ট ইঙ্গিত। কেউ তা অমান্য করতে পারে না। যুদ্ধোত্তর কসোভোতে উচকো ফেরত সৈনিকদের, হোক সে বয়সে ছোট, পরিবারের, কম্যুনিটির সবাই বেশ সম্মান করে, মান্য করে।

দ্রিতন দরোজা খোলার সাথে সাথে নিজেদের উত্তেজনাটাকে চাঙা রাখতেই যেত অহেতুক খিস্তি করতে করতে এক দঙ্গল মানুষ, ছেলে-বুড়ো, কিশোর-যুবা হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে। বাইরের গুঞ্জনটা এখন

ভেতরে, কোলাহলে রূপ নিয়েছে। কেউ কেউ দ্রুত ঘরগুলোর দিকে ছুটতে চাইলে দ্রিতন চিলের মতো দুই হাত প্রসারিত করে একটি দেয়াল নির্মাণ করে। সেই সাথে প্রচন্ড জোরে চিৎকার করে ওঠে।

থামো সবাই। কি চাও তোমরা? আমাকে বলো। বলো আমাকে।

এক মুহূর্তের জন্য সবাই চুপ মেরে যায়। এরপর গুঞ্জনটা আবার শুরু হয়।

একজন মুরুব্বী গোছের লোক, যিনি গ্রাম প্রধান, বেশ দৃঢ় কণ্ঠে প্রশ্ন করেন,
তোমার বাবা কোথায়? তাকে ডাক, আমরা তার সাথে কথা বলবো।
কথা বলাবলির কি আছে। বাচ্চাটাকে নিয়ে চলো বিদেয় হই।
অন্য একজন, যার মাথা কামানো, চোয়ালের হাঁড় বেরিয়ে আছে কচ্ছপের শেলের মতো, সে বললো।
ভিড় ঠেলে এক যুবক সামনে এসে দাঁড়ায়। দ্রিতনের কলার চেপে ধরে।
তুই উচেকা? থু। আদেম ইয়াশরের হাতে হাত রেখে কি শপথ নিয়েছিলাম আমরা? বলেছিলাম না, আমরা শিপনঈয়া হয়ে ইলের সম্প্রদায়ের সম্ভ্রম পাহারা দেব। ইলেরের অসম্মান কোনদিন হতে দেব না? আজ তোর ঘরে সার্বের রক্ত!

মাথায় রক্ত উঠে যায় দ্রিতনের। চোখের সামনে ও দেখতে পায়, সার্বিয়ান আর্মি নির্বিচারে গণহত্যা করছে। আলবেনিয়ান মা-বোনদের ধর্ষণ করছে। দ্রেনিৎসার পাহাড়ে মহান নেতা আদেম ইয়াশরে ইলের সম্প্রদায়ের সম্ভ্রম রক্ষার জন্যে, স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ করতে করতে পরিবারের ৫০ জন সদস্যসহ কি নির্মমভাবে প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছে। আজো কসোভো স্বাধীন হলো না। আদেম ইয়াশরের রক্ত কি বৃথা যাবে? হাজারো ইলেরের রক্তে ভেজা কসোভোর মাটি। শত শত নারীর সম্ভ্রমহানীর গ্লানি অসহায় পরিবারগুলোর বুকে তৈরী করেছে গভীর ক্ষত। আজ পুরো ইলের সম্প্রদায় ক্ষত-বিক্ষত। সর্বত্রই জ্বলছে ক্রোধের, কষ্টের আগুন। কে এই আগুন জ্বালিয়েছে? শত বছর ধরেই ইলেরের রক্ত-মাংস দলিত-মথিত করছে সার্বিয়ানরা। আর আজ সেই সার্ব রক্ত আমারি ঘরে! এক উচেকা বীরের ঘরে!

পরক্ষণেই ভাবে দ্রিতন। মায়ের রক্তের কি কোন মূল্য নেই? এই শিশুটিতো এক উচেকা বীরাঙ্গনারও সন্তান।

দ্রিতনের এই যুক্তি কেউ মানে না। পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পিতার পরিচয়ই আসল। এই শিশুর আসল পরিচয় একদিন ঠিকই বেরিয়ে পড়বে। ও কিছুতেই সুলেইমানী হতে পারবে না। এই শিশু দিন দিন যতো বড় হবে ততোই অপমানের ভারে নুয়ে পড়বে সুলেইমানী পরিবার, পুরো রাহোভেচ, এমন কি কসোভোর পুরো ইলের সমাজ। কাজেই এই অপমানের শেকড় এখনই কেটে ফেলতে হবে।

দ্রিতন ভাবে এমিনের কথা, আফ্রিমের কথা, ইলিরিয়ানার কথা, ওর বাবা ইদ্রিসের কথা, যিনি বলেছিলেন অস্ত্র নয়, বুদ্ধি দিয়ে অর্জন করতে হবে স্বাধীনতা।

যে যুবকটি ওর কলার চেপে ধরে, ওরই সহযোদ্ধা, ওর কাঁধে হাত রাখে দ্রিতন। টেনে নিয়ে যায় কিছুটা আঁড়ালে, নাশপাতি গাছটার ছায়ায়।

যুবকটি ফিরে এসে নিচু গলায় গ্রামপ্রধানের সাথে কথা বলে। এরপর গুঞ্জনটা ফিরে যায়।